মূল প্রবন্ধের-সারসংক্ষেপ

জাতীয় মতবিনিময় সভা

খাদ্য নিরাপত্তা: কৃষি ও কৃষকের ভূমিকা

প্রনয়ণে:

এ.কে.এম. মাসুদ আলী
নির্বাহী পরিচালক
ইনসিডিন বাংলাদেশ

প্রধান অতিথি:

ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক,

মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশেষ অতিথি:

শওকত মোমেন শাজাহান,এমপি, সভাপতি কৃষি মন্ত্রণালয় সর্ম্পকিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

ফজলে হোসেন বাদশা, এমপি, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, জাতীয় কৃষক সমিতি

এডভোকেট খন্দকার শামসুল হক রেজা, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কৃষক লীগ

মো: নাজিমউদ্দিন, সিনিয়ার সহ-সভাপতি, জাতীয়তাবাদী কৃষক দল

আয়োজনে:

INCIDIN Bangladesh
http://www.incidinb.org

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

মাহ্‌বুব কবির মেমোরিয়াল হল, বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২

খাদ্য নিরাপত্তা এবং এর নির্দেশকসমূহ

জাতিসংঘের মান অনুসারে খাদ্য নিরাপত্তার ত্রিমাত্রিক নির্দেশকগুলো নিম্নরূপ:

১. খাদ্য নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হলো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খাদ্যের সহজলভ্যতা
২. খাদ্য নিরাপত্তার অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যথার্থ গুণগতমান ও পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা
৩. খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতিসংঘ কমিটি খাদ্য নিরাপত্তার নিম্নলিখিত ৩টি বৈশিষ্টকে চিহ্নিত করেছে- খাদ্যের সহজলভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা ও খাদ্যের উপযোগীতা

বিশ্বের সকল দেশের জন্য গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার অগ্রগতি ও সুরক্ষায় এবং সকল নারী ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণার্থে সকলের জন্য টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ একটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়।

খাদ্য সার্বভৌমত্ব

খাদ্য সার্বভৌমত্ব হলো বিশ্বের সকল জনগণ, জনগোষ্ঠী ও দেশসমূহের সেই অধিকার যার মাধ্যমে তাঁদের কৃষি, শ্রম, মৎস্য আহরণ, খাদ্য এবং ভূমি সংক্রান্ত নীতিসমূহ যেগুলো প্রতিবেশগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিবেচনায় তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা প্রণয়নের অধিকারকে নিশ্চিত করে। প্রকৃতভাবে খাদ্য ও খাদ্য উৎপাদনের অধিকার অর্থাৎ সকল জনগণের জন্য নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য যথাযথমানের খাদ্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা এবং খাদ্য উৎপাদনের উপায় ও সক্ষমতাকে তাঁদের নিজ নিজ সমাজের টেকসই অগ্রগতি সাধনের কাজে কার্যকর ভাবে ব্যবহারের অধিকারই হলো খাদ্য সার্বভৌমত্ব।
খাদ্য সার্বভৌমত্বের কাঠামো কৃষকের খাদ্য উৎপাদনের সক্ষমতা বজায় রাখা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উৎপন্নের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির বিষয়টিতে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে। এই সংক্রান্ত বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য একটি নতুন নীতিকাঠামো প্রণয়ন করা জাতিসংঘের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। এই নীতিকাঠামোতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত হওয়া প্রয়োজন-

- স্থানীয় এবং আঞ্চলিকভাবে জনগণের খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধান, ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের ভূমি, পানি, বীজ এবং ঋণ প্রাপ্তির অধিকারকে অগ্রাধিকার প্রদান। এর সাথে ভূমি সংস্কার, জীন পরিবর্তিত শস্যাদি প্রবর্তন প্রতিরোধ, বিনামূল্যে বীজ প্রাপ্তির অধিকার এবং জলের উৎস্যসমূহকে জনগণের সাধারণ সম্পদ হিসেবে সংরক্ষণের বিষয়কেও যথাযথ গুর"ত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।
- কৃষক ও ক্ষুধে কৃষকদের খাদ্য উৎপাদনের অধিকার এবং কার দ্বারা উৎপাদিত, কি ধরণের খাদ্য ভোক্তারা চান তা পছন্দের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- কৃষি উৎপন্নের মূল্য নির্ধারিত হবে কৃষি উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারনে কৃষক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- কৃষি এবং খাদ্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারী নারীদের ভূমিকার স্বীকৃতি দিতে হবে
- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে জাতিসংঘকে নতুন একটি নীতি কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে যার মধ্যে নিন্মোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে- ক) স্থানীয় ও আঞ্চলিক চাহিদাভিত্তিক উৎপাদনকে রফ্তানির আগে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে, বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলসমূহকে কৃত্রিমভাবে হ্রাসকৃত মূল্যের আমদানি থেকে সুরক্ষার অধিকার দিতে হবে; খ) কৃষকদের জন্য রাষ্ট্রীয় সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তা রফ্তানি বা পণ্যমূল্যের ওপর গুরুতর প্রভাব না ফেলে।
- সরবরাহ ব্যবস্থাপনা চুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্যে মূল্য স্থীতিশীল রাখতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খাদ্য অধিকার

মানসম্পন্ন ও যথেষ্ট পরিমান খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ক্ষুধা মুক্তি এবং খাদ্য অধিকারের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত বিষমুক্ত খাদ্য প্রাপ্তি এবং বিষমুক্ত, সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য যথেষ্ট পরিমাণ শারীরিক এবং অর্থনৈতিকভাবে সহনীয় এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ধারাবাহিক সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধানকারী।

খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধারণাসমূহের সারসংক্ষেপ

- **"খাদ্য নিরাপত্তা" হচ্ছে একটি কারিগরী ধারণা**
- **"খাদ্য সার্বভৌমত্ব" হচ্ছে একটি রাজনৈতিক ধারণা**
- **"মানসম্মত যথার্থ পরিমাণ খাদ্যের অধিকার" একটি আইনী ধারণা**

বর্তমান খাদ্য ব্যবস্থাপনার অবস্থা এবং চালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশসহ এশিয়ার অনেক দেশেরই- মৌসূমী অনাহার বা দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টি বা চলমান খাদ্যাভাব এবং দারিদ্রের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সর্বশেষ তথ্য বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে, এশিয়া-প্রশান্ত অঞ্চলে ৫০ কোটি মানুষ দীর্ঘমেয়াদী খাদ্যাভাবে ভুগছে। এক হিসাব মতে, যদিও কৃষি উৎপাদন, বাংলাদেশে গত ৩০ বছরে উচ্চতর উৎপাদনশীলতা এবং শস্য বহুমুখীকরণের ফলে উল্যেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু তার পরেও ১৬ কোটি মানুষের ভিতর ৪৫ শতাংশ প্রতিদিন তাদের প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে কম ক্যালরি গ্রহণ করে থাকে। এক হিসাবে ৫৩ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য মতে, খাদ্য বিভাগ, খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে, প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে এবং দু:স্থ জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহায়তা এবং ত্রাণ কার্যক্রমে নিবেদিত রয়েছে। আমদানি এবং আভ্যন্তরীন ক্রয়-এই দুই উপায়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য সংগ্রহ করে। এই বছরের সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখ পর্যন্ত, মোট খাদ্য মজুদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪.৭২ লাখ মেট্রিক টন (চাল ১১.৬৯ লাখ মেট্রিক টন এবং গম ৩.০৩ লাখ মেট্রিক টন)। তাছাড়া, ০.০৪ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য বন্দরে খালাসের অপেক্ষায় ছিল। গতবছর একই দিনে খাদ্য শস্য মজুদের পরিমাণ ছিল ১৩.৩৯ লাখ মেট্রিক টন। বাংলাদেশের খাদ্য শস্য আমদানির প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ২০০৯-১০ অর্থবছরের চেয়ে ২০১০-১১ অর্থবছরে বিদেশ থেকে খাদ্য শস্য সাহায্যের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ১৭২%, সরকারি বাণিজ্যিক আমদানি বেড়েছে ৩১৭% এবং মোট সরকারি আমদানি বেড়েছে ৩৫০%।

অর্থবছর	খাদ্য সাহায্য প্রাপ্তি			সরকারি বাণিজ্য আমদানি			মোট আমদানি			বেসরকারি বাণিজ্য			মোট জাতীয় আমদানি		
	চাল	গম	মোট	চাল	গম	মোট	চাল	গম	মোট	চাল	গম	মোট	চাল	গম	মোট
২০০৯/১০	৪	৫৬	৬০	৫২	৪৪৫	৪৯০	৪	৫৬	৪৯০	৩৭	২৮৬৩	২৮৯৯	৮৭	৩৩৬২	৩৪৪৯
২০১০/১১	৬	১৫৭	১৬৩	১২৬৪	৭৭৭	২০৪১	১২৭০	৯৩৪	২২০৪	২৯১	২৮১৮	৩১০৯	১৫৬১	৩৭৫২	৫৩১৩

সূত্র: খাদ্য বিভাগ; USAID প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ খাদ্য সাহায্য হিসাবে যে পরিমাণ গম গ্রহণ করেছিল তা এই তথ্যে যোগ করা আছে।

এই সব তথ্য প্রতিয়মান করে যে, পর্যাপ্ত খাদ্যে প্রাপ্তির নিশ্চিত করতে সরকারের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে। অন্যদিকে খাদ্য সংগ্রহের দ্বিতীয় উপায়কে (অভ্যন্তরীন সংগ্রহ) সরকারের আভ্যন্তরীণ-ক্রয় নীতিতে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে, কৃষকদের কাছ থেকে ধান, চাল ও গম সরাসরি ক্রয় করা হবে। এক্ষেত্রে কৃষক বাছাই প্রক্রিয়া সরকারী সার্কুলারের মাধ্যমে জানানো হবে। অন্যদিকে, সরকার চাল ক্রয় করবে লাইসেন্সধারী চাল-কলগুলো থেকে। তবে ২০১১ সালের একটি খবরের কাগজের প্রতিবেদনে বাজার বিশ্লেষকরা বলেছেন, ঐ বছরের বোরো মৌসুমের সরকারী ক্রয় কার্যক্রম এক মাস বিলম্বে শুরু হওয়া এবং ধান ক্রয় না করার সিদ্ধান্ত - কৃষককে লেকসানের মুখে ফেলে দেয়। অন্যদিকে লাভবান হন মিল/চাতাল মালিকরা। ঐ বছর ২রা জুন, সরকার বোরো মৌসুমে চাল ক্রয়ের লক্ষ্য নির্ধারন করে মোট ৬ লক্ষ টন এবং কোন ধান ক্রয় করা হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সরকারী সুত্র মতে, যেহেতু ধানের উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ১৪.৬৫ টাকা ধার্য করা হয়েছে সেহেতু

চালের মূল্য প্রতি কেজি ২৯ টাকা ধরলে কৃষক ২৫ শতাংশ লাভ করতে পারতেন। প্রতিবেদনটি এটাই ইঙ্গিত করে যে, বাজারের নিয়ন্ত্রণ চাতাল মালিক ও পাইকার ব্যবসায়ীদের হাতে থেকে যায়। যার কারণে কৃষক ও গরীব ভোক্তাদের সাহায্য করার জন্য সরকারী প্রয়াস কা র্যকর হয়নি।

একটি নীতি-পর্যালোচনা মতে[১], ২০০৭-০৮ সালের বিশ্ব খাদ্য সংকটের পর দাতাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষির উন্নয়নে বিনিয়োগের অঙ্গীকার নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। তাৎক্ষণিকভাবে ২০০৯ সালের জুলাইয়ে জি৮ সম্মেলণে দাতাগোষ্ঠীরা খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষিতে তিন বছরে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক, উভয়ভাবে, ২০০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। নতুন এই অনুদান সংগ্রহ পরিকল্পনায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ফুড ফ্যাসিলিটি ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ফিড দ্যা ফিউচার-এর উদ্যোগে বিশ্ব কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
খাদ্য নিরাপত্তায় এই অনুদান বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সুযোগ। তবে, এক্ষেত্রে দক্ষ ও সুসংগতভাবে সম্পদ বিনিয়োগ করাটাও আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে। খাদ্য নিরাপত্তা প্রকৃতিগত দিক থেকে একাধিক খাতের সমন্বয়ে নিশ্চিত করতে হয়। এটি কৃষি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন বিভাগের সাথে আন্তনির্ভরশীল। কৌশলগত পরিকল্পনা ও সমন্বয় ছাড়া, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে সঠিকভাবে বিনিয়োগ প্রবাহ নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়বে।

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলদের, খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে ধারনা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় খাদ্য নীতি(২০০৬) এর উপর ভিত্তি করে একটি কর্মকৌশল (২০০৮-২০১৫) প্রণয়ন ও অনুমোদন করেন। এ পরিকল্পনায় খাদ্যনীতির তিনটি মূল লক্ষ্যকে কার্যকর ও প্রয়োগযোগ্য কর্মকৌশলে রুপান্তরিত করেছে এবং এর অগ্রাধিকার ঠিক করেছে। এই উদ্যেশ্যগুলো হলো- ১) যথেষ্ট পরিমাণে এবং স্থিতিশীলভাবে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করা, ২) জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যথেষ্ট খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ও ৩) প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বিশেষত নারী ও শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা। তবে খাদ্য নীতিরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- অধিকার হিসাবে খাদ্যকে বিবেচনায় না আনা।

উৎপাদন বৃদ্ধি সত্বেও বাংলাদেশে এখনও খাদ্য উৎপাদন এবং এর বহুমুখীকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। খাদ্য প্রাপ্যতার মাত্রা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন খাদ্য উৎপাদন বহুমূখীকরণ, এর স্থায়িত্বশীলতা এবং এই খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি। এছাড়াও জলবায়ূ পরিবর্তনের সাথে খাপখাওয়ানো প্রয়োজনীয়তাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আর মনযোগ দিতে হবে কৃষি বিপনন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে।
কার্যক্রমের সূচনাবিন্দু হিসেবে গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকে গ্রহন করতে হবে এবং এক্ষত্রে নতুন ধরণের ধান ও ধান ছাড়াও অন্যান্য কৃষির নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনেও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। শস্য বহুমূখীকরণের কর্মসূচী প্রনয়ন এবং পশু সম্পদ ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে অধিকতর আর্থিক বরাদ্ধ; কৃষি উপকরণ ও ঋণ প্রাপ্তি সহজতর করার পাশাপাশি সার ও কীটনাশকের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং সরকারী ক্রয় কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদকের স্বার্থ রক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতি আবশ্যক।

সম্প্রতি, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের, মাননীয় মন্ত্রী, ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, জানিয়েছেন (দৈনিক প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২), বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় আড়াই হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সরকার প্রতি জেলায় একটি করে খাদ্য গুদাম নির্মান করতে যাচ্ছে। এতে আরো ১২ লাখ মেট্রিক টন দানাদার শস্য সংগ্রহ করা যাবে। ফলে সরকারের সংগ্রহ ক্ষমতা বেড়ে দাড়াবে ৩০ লাখ মেট্রিক টনে। গতবছরের তথ্য অনুযায়ী মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন হয়েছে ৩.৫ মিলিয়ন টন। কাজেই প্রস্তাবিত এই বৃদ্ধি ঘটলেও সরকারী খাদ্য-গুদামের ধারণ ক্ষমতা মোট শস্য উৎপাদনের ১০% শতাংশের নীচেই থেকে যাবে। যদি কৃষকরা কমিউনিটি ভিত্তিক/গ্রাম-ভিত্তিক খাদ্য গুদাম নির্মানে সরকারের উৎসাহ এবং সাহায্যে পায়, তাহলে তুলনামূলক স্বল্প ব্যয়েই খাদ্য মজুদের সক্ষমতা জ্যামিতিকভাবেই বেড়ে যাবে।
এছাড়াও আংশিক বা পূর্ণ মূল্য প্রদান পূর্বক চুক্তি-পত্রভিত্তিক আগাম ক্রয় ও খোদ কৃষকের গোলায় আভ্যন্তরীন খাদ্য সংগ্রহের আওতায় শস্য সংরক্ষণ কৃষক-সরকার-সহযোগীতার নতুন সোপান গড়ে তুলতে পারে ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সাথে প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে পারেন।

[১] খাদ্য বিভাগের পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ ইউনিট, NFCSP-FAO

সমাপনী প্রস্তাবনা:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় অধ্যায়; ১৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে " *রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন , যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়: ক. অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;" ।* সুতরাং সংবিধান স্বীকার করে যে কৃষি নিছক বাণিজ্যের কোন বিষয়সূচি নয় ; এটি প্রাথমিকভাবে নাগরিক অধিকার এবং রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িতের সাথে সম্পর্কিত্ব। খাদ্যের অধিকার বলতে শুধুমাত্র প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল উৎপাদন এবং পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তাকেই বেঝায় না। এর সঙ্গে আরো জড়িত রয়েছে কৃষক এবং পরিবেশের পর্যাপ্ত খাবার এবং আশ্রয়ের আইনি অধিকার।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে বাজার ভিত্তিক খাদ্য নিরাপত্তা নীতি/ ব্যবস্থাকে পুর্নমূল্যায়ন প্রয়োজন কারণ কৃষকদের জীবিকার নিরাপত্তা এবং পর্যাপ্ত উৎপাদন, সংগ্রহ ও বিতরণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রের ভূমিকা, যা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব , সেগুলো লঙ্ঘন করছে বাণিজ্য চুক্তিগুলো। এ ক্ষেত্রে খাদ্য সার্বভৌমত্বের ধারণা একটি নতুন যুগের সূচনা করতে পারে। খাদ্যশস্য আমদানি জাতির উপর ঋণের বোঝা আরোপ করে, অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ ক্রয় কার্যক্রম, মজুদ পদ্ধতি ও অবকাঠামো কৃষকদের বড় একটি অংশকে বাদ দিচ্ছে। এর পিছে আছে প্রযুক্তিগত বাধা, নীতিগত গুরুত্বের অভাব, পক্ষপাতিত্বমূলক বাস্তবায়ন এর কারণে। খাদ্য উৎপাদনের বহুমূখীকরণ, খামার পর্যায়ে ক্রয় কার্যক্রমের অগ্রাধিকার এবং কমিউনিটি/গ্রাম ভিত্তিক মজুদ বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারে। এ ছাড়াও কৃষকদের সমবায়/যৌথ উৎপাদন এবং বিপণন কাঠামো তৈরি করা হলে তারা বৃহৎ সরবরাহকারী হিসাবে কর্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে। এ ব্যবস্থাগুলো উৎপাদন ও বিপণন খরচ কমাবে-যা আবার সামগ্রিকভাবে খাদ্যের খরচ কমাবে।

একই সময়ে আমরা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি খাদ্য ও কৃষি সংক্রান্ত বিষয়গুলো একটি সমন্বিত নীতি, আইনি এবং প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় আনার, যার প্রাথমিক দায়িত্ব হলো নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ। এ প্রেক্ষিতে;

- আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে খাদ্য অধিকারকে আমাদের সাংবিধান ও মানবাধিকার সংক্রান্ত সনদ/ কনভেন্টস ইত্যাদির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে স্বীকার করে নিতে হবে।.
- জাতীয় খাদ্য নীতি এমন হতে হবে যা কৃষকের খাদ্য সার্বভৌমত্ব এবং জীবিকার নিশ্চয়তা দিবে কারণ খাদ্য শুধুমাত্র বিপণন ও বানিজ্যের উপযোগী পন্য নয়- অধিকার ও জননিরাপত্তার অনুষঙ্গ।
- খাদ্যের আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ হতে হবে নির্দিস্ট সময়ে (মৌসুমের শুরুতেই), যাতে করে প্রকৃত কৃষকেরা এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে পারে। সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে খামার পর্যায়ের পণ্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে (যেমন- চাল নয় বরং ধান)। এছাড়াও সরকারি খাদ্য ক্রয় কার্যক্রম পরিকল্পনায় খাদ্য সম্পর্কিত জাতিগত বৈচিত্রকে বিবেচনায় নিতে হবে। সরকারি খাদ্য ক্রয় কার্যক্রমের এই উপাদানগুলো আইনি বাধ্যবাধকতার ভিতর নিয়ে আসতে হবে।
- সরকারী পর্যায়ে বিকেন্দ্রীত খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কমিউনিটি/গ্রাম- ভিত্তিক খাদ্য মজুদ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- সরকারি খাদ্য ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কে কৃষকদের তথ্য প্রদান ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য এবং তৎসম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের জন্য ডিজিটাল (হালনাগাদ তথ্য-যোগাযোগ) প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে।
- কৃষিকে বাণিজ্য অধিকারের অংশ হিসেবে না দেখে বরং খাদ্য অধিকারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বিবেচনা করে জাতীয় কৃষি নীতি প্রণয়ন করতে হবে যা বিবেচনায় রাখবে জাতিগত বৈচিত্র্য এবং পরিবেশগত সুরক্ষা মত সংবেদনশীল বিষয়সমূহ।

-সমাপ্ত-